আল্লাহর গোপন চেহারা

সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

আল্লাহ্‌র গোপন চেহারা

সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

আল্লাহ্‌র গোপন চেহারা

সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশক: দি কাসওয়া প্রকাশনী

প্রচ্ছদ: দি কাসওয়া কম্পিউটার

প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৩

বিনিময়: ৩০ টাকা

The Hidden Face of Allah

Syed Badiuzzaman Faruque

অর্পন

আব্বা আম্মা দাদাভাই ও ফরীদ ভাইজানের রূহের মাগফেরাত কামনায়।

সূচিপত্র

১। ভূমিকা/৬

২। ডিজাইন থেকে ডিজাইনার/৮

৩। প্রকৃতিতে শক্তির ঐক্য/৯

৪। দার্শনিক প্রমাণ/১০

৫। আল কুরআন/১১

১। ভূমিকা

ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল, মানব-দানব সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা। এই বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস নয়। এই বিশ্বাস প্রমাণিত সত্যের উপর, নিশ্চিত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ মিথ্যার পূজারী বুদ্ধিজীবী, বক্র হৃদয়ের অধিকারী বামতাত্ত্বিকেরা ঈমানদার মানুষের ঈমান হরণ, কোমলমতি তরুণ-তরুণীদের হৃদয়ে ইসলামবিদ্বেষ সৃষ্টি, পৃথিবীতে শয়তানের রাজত্ব, অশ্লিলতার সংস্কৃতি চালু করার মানসে প্রতিনিয়ত মুসলমানদের ঈমান নিয়ে হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছে। তারা বলে, ঈমান এক নিম্ন রুচির ঠুনকো বিষয়। তাদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিই পূজনীয়। ঈমান তাদের কাছে হাস্যকর বিষয়। তাদের এ জাতীয় মনোভাব বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত, প্রচারিত হচ্ছে। তাদের এই মনোভাব অতি নিন্দনীয় ও তাদের নিজেদের জন্য চিরকালীন হতভাগ্য জীবনের নিদর্শন। আল-কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন, “আর বামদিকের দল, কত হতভাগ্য বামদিকের দল! উহারা থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রেরছায়ায়, যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগবিলাসে এবং উহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে। আর উহারা বলিত, ‘মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি উত্থিত হইব আমরা? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণও? বল, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ- সকলকে একত্র করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। অতঃপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা। তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্কাম বৃক্ষ হইতে, এবং উহা দ্বারা তোমরা উদরপূর্ণ করিবে, পরে তোমরা পান করিবে উহার উপর অত্যুষ্ণ পানি আর পান করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদের আপ্যায়ন।” (সূরা ওয়াকিয়াঃ ৪১-৫৬)। এই যে পরিণতি আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন বামদিকের দলের লোকদের জন্য তারা আল্লাহ্র অস্তিত্বে অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্ত কাফের। একথাটি উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের একটি আয়াত। আর আমরা বাস্তবে কী দেখছি। সারাবিশ্বে ও বাংলাদেশে বামপন্থি নামক এক দল লোক রয়েছে যারা প্রধানতঃ নাস্তিক্য মনোভাবসম্পন্ন। অতএব, অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, দুনিয়ার বামপন্থিরাই কিয়ামতের দিন বামদিকের দল। আর তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও হতভাগ্য পরিণতি। সুতরাং এখনই সাবধান হতে হবে যেন বামপন্থার সাথে কেউ না জড়ায়। বামপন্থি হিসেবে দুনিয়ায় নাম লেখালে আল্লাহ্র কাছেও আসহাবুশ শিমাল বা বামদিকের দলের লোক হিসেবে হাজির হতে হবে এবং ভোগ করতে হবে নির্মম শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, অপমানজনক শাস্তি এবং ঠাই হবে জাহান্নামে যেখানে কোন শান্তি নেই, চিরকাল কেবল আযাব আর আযাব।

কেন মানুষ আল্লাহ্র অস্তিত্বে, মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেসালতে, ইসলামের সত্য ধর্ম হওয়ায়, জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে অবিশ্বাস পোষণ করে?

এটা তাদের নিজেদের কারণে, নিজেদের অন্তরের বক্রতার কারণে, নিজেদের অন্তরের অপবিত্রতার কারণে, সঙ্গ দোষে ইত্যাকার বিভিন্ন কারণে। সর্বোপরি, তারা স্পষ্ট বিষয়ের অস্বীকারকারী, মিথ্যাবাদী। স্পষ্ট বিষয়টি হলো প্রকৃতির অযুত কোটি বিষয় আল্লাহ্র অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। যেদিকে তাকাই-সেদিকে আল্লাহ্র অস্তিত্বের নিদর্শন। সেদিকেই আল্লাহ্র চেহারা দেখা যায় প্রতিটি দিকে প্রতিটি সত্যের পেছনে। আল্লাহ্ গোপন, কিন্তু তাঁর চেহারা গোপন থেকে তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করছে বস্তুরাজির সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টি, প্রকৃতির ঘটনাবলী, আল্লাহ্র বাণীর অমোঘ সত্যতায়, বিজ্ঞানের সত্য থেকে, মানুষের অন্তরের সাক্ষ্যের মাধ্যমে, দুনিয়ার উত্থান-পতনের মাধ্যমে, ইত্যাদি অগণিত উপায়ে আল্লাহ্র গোপন চেহারা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আল্লাহ্ নিজেও বলেন, “He is the First and the Last, and the Manifest and the Hidden, and He knows all things full well.” “তিনিই আদি, তিনিই অন্তঃ তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।” (সূরা হাদীদঃ৩)। আল্লাহ্র চেহারা উপলব্ধিতে, বোধিতে ধরা দেয় পৃথিবী ও জগতে যে দিকেই তাকাই এবং যা কিছু নিয়ে গভীর অভিনিবেশে পর্যালোচনা করি। আল্লাহ তাই বলেন, “And to Allah belong the east and the west, so wherever you turn (your faces) there is the Face of Allah.” - “আর পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ্র, সুতরাং যেদিকেই তুমি চেহারা ফেরাবে, সেদিকেই

দেখবে আল্লাহ্‌র চেহারা।” (সূরা বাকারা: ১১৫)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “সব কিছুই ধ্বংসশীল, কেবল আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতিক্রম” (সূরা কাসাস: ৮৮)। এখানে আল্লাহ্‌র সত্তা বুঝাতে আল্লাহ্‌র চেহারা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে আল-কুরআনে বেশ কয়েক স্থানে আল্লাহ্‌র চেহারা শব্দটি এসেছে। তাই বক্ষমান প্রবন্ধের শিরোনাম আল্লাহ্‌র গোপন চেহারা রাখা হয়েছে। এ কারণে যে, এ দুনিয়ায় আমরা আল্লাহ্‌র চেহারা দেখছি পরোক্ষভাবে, কেননা এখানে তিনি গুপ্ত। আর আখেরাতে ছাড়া আল্লাহ্‌র চেহারা প্রকাশ্যে মাখলুকের কাছে ধরা পড়বে না। আল্লাহ্‌কে পরোক্ষভাবে দেখার কত যে উপায় তা বেহিসাব। অসংখ্য উপায়ে, অসংখ্য দিকে আল্লাহ্‌র চেহারার নিদর্শন মানুষের কাছে ধরা পড়ে। তারই কিছু আমি সংক্ষেপে লিখব এ প্রবন্ধে। আল্লাহ্‌ তৌফিক দান করুন।

২। ডিজাইন থেকে ডিজাইনার

সর্ব প্রধান উপলব্ধি যা আস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ লাভ করেছেন বহু শতাব্দির বৈজ্ঞানিক গবেষণার নির্যাস থেকে তাহলো এই যে, "ডিজাইন যেখানে থাকবে সেখানে ডিজাইনার অবশ্যই থাকবে।"

তাহলে প্রশ্ন হলো, মহাবিশ্বে ডিজাইন দেখা যায় কি? জবাব-নিঃসন্দেহে মহাবিশ্বের সর্বত্র ডিজাইনের উপস্থিতি রয়েছে। তাহলে কী সিদ্ধান্ত আসে? অবশ্য অবশ্যই একজন সর্বেসর্বা ডিজাইনার আছেন, যিনি আমাদের আল্লাহ, খৃস্টানদের কাছে গড নামে পরিচিত।

এবারে বিশ্লেষণ করা যাক উপর্যুক্ত তথ্য ও প্রমাণ। প্রথম কথা হলো- কেন আমরা মানবো যে, ডিজাইন থাকলেই ডিজাইনার থাকবে? আসলে এটা না মেনে উপায় নেই যে, ডিজাইন থাকলে ডিজাইনার থাকবে। ধরা যাক, আপনি এক পরিত্যক্ত ও শূন্য দ্বীপে গেলেন এবং দেখতে পেলেন সমুদ্র সৈকতে SOS শব্দগুচ্ছ লেখা রয়েছে। তখন আপনি ভাববেন না যে, হয়তো বায়ু কিংবা সাগরের ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে দৈবক্রমে ঐ SOS লেখা হয়ে গেছে, বরং আপনি ভাববেন যে, সেখানে বুদ্ধিমান কেউ গিয়েছিল এবং সে ঐ মেসেজটি বালিতে একে রেখেছে। যদি ঐ দ্বীপে আপনি পরিত্যক্ত কোন পাথুরে ঘর দেখতে পান যার দরজা-জানালা সবই আছে, তখন আপনি ভাববেন না যে, ঝড়ের মাতমে ঐ পাথুরে ঘর তৈরী হয়েছিল দৈবক্রমে। বরং আপনি ভাববেন কোন কৌশলী মানুষ ঐ ঘর বানিয়েছিল। অর্থাৎ এটা সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, ডিজাইন থাকার মানে ডিজাইনার থাকবেই।

৩। প্রকৃতিতে শক্তির ঐক্য

আল্লাহ্‌কে দেখা যায় যখন আমরা মহাবিশ্বে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলো নিয়ে ভাবি। পৃথিবীর পরিবেশে জীবন যেমন লভ্য, মহাবিশ্বের অন্যত্র তেমন নয়। জীবন তথা উদ্ভিদও প্রাণীর গঠন উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যর মাধ্যমে পাওয়া যায়। জীবনের নিগূঢ় রহস্য বায়োলজির মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। বায়োলজি সবচেয়ে মৌলিক কোন জ্ঞান নয়। বায়োলজির জ্ঞান রসায়নবিদ্যা বা কেমিস্ট্রির মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। রসায়ন শাস্ত্র সবচেয়ে মৌলিক নয়। রসায়ন বিজ্ঞানের জ্ঞান পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের মাধ্যমে উৎপন্ন। আর পদার্থবিজ্ঞান মহাবিশ্ব পুরোটাই ব্যাখ্যা করে বস্তুনিচয়ের মাঝে ক্রিয়াশীল কয়েকটি বল বা শক্তির সাহায্যে। দেখা গেছে, মহাবিশ্বের সকল কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় চারটি মৌলিক শক্তির মাধ্যমে। এগুলো হলো- (১) মহাকর্ষ বল, (২) তড়িৎচুম্বকীয় বল, (৩) দূর্বল নিউক্লিয় বল ও (৪) সবল নিউক্লিয় বল। গত শতাব্দির শেষ ভাগে এসে জানা গেছে যে, মৌলিক বল একটি কমে মোট তিনটি। অর্থাৎ উর্পযুক্ত (২) ও (৩) নং বল- একই শক্তির দুটি রূপ। ফলে মহাবিশ্ব শাসন করে মহাকর্ষ, ইলেকট্রো-উইক ও সবল নিউক্লিয় বল। এখন বিজ্ঞানীরা প্রায় প্রমাণ করে ফেলেছেন যে, ইলেকট্রো-উইক ও সবল নিউক্লিয় বল আসলে একই শক্তির দুটি রূপ। তাহলে মহাবিশ্ব শাসন করছে মোটে দু'টি বল, যথা- মহাকর্ষ ও অন্য একটি যেটিমূলতঃ তড়িৎচুম্বকীয়, দূর্বলনিউক্লিয় ও সবলনিউক্লিয় বলের একীভূত রূপ। এবারে দেখুন- বিজ্ঞানীরা জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এটা প্রমাণ করতে যে, মৌলিক বল মোটে একটি। অর্থাৎ উপরোল্লিখিত চারটি শক্তির একটি একীভূত রূপ আছে। সেটিই অর্থাৎ একটি একক শক্তির মাধ্যমে জগত শাসিত হয়। এই যে একমুখীনতা অর্থাৎ একক শক্তির বহিঃপ্রকাশ এই যে মহাবিশ্ব; এই মহাবিশ্ব কি তাহলে সেই একক শক্তির একক মালিকের দিকেই আমাদেরকে ধাবিত করছে না? মহাবিশ্বের বৈচিত্র্য যদি বৈচিত্র্যই হয়ে থাকতো- তবে আমরা একক স্রষ্টায় বিশ্বাস না করেও পারতাম। কিন্তু মহাবিশ্বের বৈচিত্র্যেও গভীরে রয়েছে কেন্দ্রিকতা, একক শক্তির অস্তিত্ব। তাহলে একক স্রষ্টা সেই একক বলের মালিক- এতো এক ধ্রুব সত্যের নামান্তর। এই আলোচনায় স্পষ্ট হলো যে, মহাবিশ্বের শক্তিগুলোর একমুখীনতা- একক স্রষ্টা আল্লাহ্‌র চেহারাই পরিস্ফুট করছে।

৪। দার্শনিক প্রমাণ

ইতিহাসে বিরাট এক সময়কাল অতিবাহিত হয়েছে যখন জানা ছিল না যে, মহাবিশ্বের শুরু বা সৃষ্টির ক্ষণটি ছিল কি না। মাত্র বিংশ শতাব্দিতে এসেই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মহাবিশ্ব আজ থেকে মোটামুটি ১৩৭৩ কোটি বছর পূর্বে বিগ ব্যাং নামের এক মহাবিস্ফোরণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব অনাদি নয়, এর প্রারম্ভ আছে। শুধু এতটুকু একটি তথ্য এক মহাজ্ঞানের দ্বার খুলে দিয়েছে। যদিও এই দার্শনিক জ্ঞান যখন উন্মেষ লাভ করেছিল তখন- মহাবিশ্বের প্রারম্ভ আছে কি না, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছিলনা। কিন্তু কুরআনিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে দার্শনিক শ্রেষ্ঠ ইমাম গায্যালী রাহিমাহুল্লাহ এক মহাদার্শনিক যুক্তির অবতারণা করলেন। একে বলে Syllology বা তিন ধাপের যুক্তির প্রমাণ। ইমাম গায্যালী বললেন- (ক) যা কিছুর শুরু আছে, তার পেছনেই কারণ ক্রিয়াশীল, (খ) মহাবিশ্বের শুরু আছে, তাই (গ) মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে কারণ ক্রিয়াশীল। ফলে- সেই কারণ একক হবে কেননা- মহাবিশ্ব একক। সেই একক কারণ মহান স্রষ্টা- আল্লাহ। পাঠক, এখানে প্রসঙ্গতঃ বলে দেই যে, এই বিষয়ে বহু দার্শনিকের মতই বার্টান্ড রাসেল ভুলের উপর ছিলেন। তিনি বলেন, সবকিছুর পেছনে কারণ ক্রিয়াশীল থাকা যদি সাবস্ত হয়, তবে খোদার অস্তিত্বের পেছনেও অন্য কারণ ক্রিয়াশীল থাকতে হবে। রাসেলের এই যুক্তি ইমাম গায্যালীর উপর্যুক্ত Syllology যাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নাম দিয়েছেন Kalam cosmological argument দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়। যার শুরু আছে কেবল তার জন্যই কারণ ক্রিয়াশীল সাব্যস্ত। যার শুরু নেই তার পেছনে কোন কারণ থাকবে না। এ কারণে - খোদা যেহেতু অনাদি, তার অস্তিত্ব কারণ বহির্ভূত। এ প্রসঙ্গ এতটুকুই যে, এক মহাবিশ্বের শুরু আছে বলেই- তার অস্তিত্বের পেছনে একক কারণ তথা স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের ভূমিকা রয়েছে। এভাবে আবারও আমরা প্রত্যক্ষ করলাম মহান আল্লাহ্‌র গোপন চেহারা।

৫। আল কুরআন

আল্লাহ্‌তায়ালাকে পাওয়া যায় তাঁর বাণীর মাধ্যমে। আল-কুরআন এক অলৌকিক কিতাব। এই কিতাবে যে সকল অজানা বিষয়ের অবতারণা হয়েছে খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে- তখনকার জগতের কোন মানুষের সেগুলো জানাটা অসম্ভব। ফলে- বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে আল কুরআনের অলৌকিকত্ব পৃথিবীবাসীর কাছে দিবালোকের মত সত্য হয়ে ধরা দিচ্ছে। আল্লাহ্‌কে দেখা যায় আল-কুরআনে দৃষ্টি দিয়ে, সে দৃষ্টির সাথে মহাবিশ্বের জানা দৃশ্যাবলীর সাদৃশ্য দিয়ে। আল্লাহ নিজেও বলেন; "এখন আমি তাদের জন্য আমার নির্দেশনাবলী দেখাব, বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, উহাই (আল কুরআন) সত্য। (সূরা হা-মীম আস সাজদা: ৫৩)। আল্লাহ্‌র এই বাণীর র্মম হলো- আল-কুরআনে যেসব বৈজ্ঞানিক বিষয় রয়েছে তা একে একে মানুষের কাছে সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে ধরা পড়বে ধীরে ধীরে মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে। আল্লাহ্‌ যে বলেছেন- আমি তাদের দেখাব আমার নিদর্শনাবলী, এর মানে হলো- মানুষ তার বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রায় মহাবিশ্বের যেসকল বিষয় প্রত্যক্ষ করবে, সেসকল তো আল্লাহ্‌রই নিদর্শন আর এসব নিদর্শনের অনেকগুলোই আল্লাহ্‌ চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল-কুরআনে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এখন মানুষ মহাবিশ্বের রহস্য দেখবে আর দেখবে আল কুরআনে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তখন মানুষ বলতে বাধ্য হবে যে, আল-কুরআন বলছে- মহান ও একক স্রষ্টা আল্লাহ্‌ই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, পালনকর্তা। আল-কুরআনের এই ঐশী উৎস থেকে যে সকল নিদর্শন ধীরে ধীরে মানুষের কাছে ধরা পড়ছে- তার কয়েকটি একে একে আমি বর্ণনা করব।

(ক) মধুমক্ষিকার ভ্রমণ

আল্লাহ্‌র সৃষ্টিরাজির মাঝে মৌমাছি এক বিশেষ পতঙ্গ। এর রয়েছে এমন মস্তিষ্ক, যে মস্তিষ্কের সাহায্যে এরা সূর্যের আলোকরশ্মির পোলারাইজড ফিল্ড অনুসরণ করতে পারে। আলোকরশ্মি সাধারণত আনপোলারাইজড রশ্মি কিছুটা পোলারাইজডও হয়। পৃথিবীর উপরিতলে প্রতিটি স্থানে আলোকরশ্মির একটি ফিল্ড প্যাটার্ন তৈরী হয়। ঐটি চিনে নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে মৌমাছির। তো মৌমাছি পথ চিনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, সূর্যালোকের ইলেকট্রিক ফিল্ড অনুসরণ করে। মৌমাছি ছাড়া অন্য প্রাণী বা পতঙ্গের এই গুণ নেই। এই ইলেকট্রিক ফিল্ড অনুসরণ করে চলাচল করার ক্ষমতা মৌমাছিকে দিয়েছেন স্রষ্টা আল্লাহ্‌। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন, "তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন; 'গৃহনির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষের গৃহে; অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর, অতপরঃ তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর।" (সূরা নাহলঃ ৬৮-৬৯)। এই আয়াতে মৌমাছিকে আল্লাহ্‌র দেয়া সহজ পথ অনুসরণ করার প্রসঙ্গটি আসছে কেন? এসেছে এজন্যই যে, মৌমাছির পথ অনুসরণ করার বিশেষ ব্যবস্থা যা উপরে আলোচিত হয়েছে তা আছে। এই বিশেষ ব্যবস্থা অন্য কোন প্রাণীর বেলায় অনুপস্থিত । মৌমাছির এই বিশেষ গুণাবলীর ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ই করেছেন, আর তিনি তা করেছেন বলেই, তার কিতাবে এ প্রসঙ্গ এনেছেন। ফলতঃ দুটি বিষয় এখানে পরিস্ফুট হলো। আল্লাহ্‌ মৌমাছির জন্য পথ চেনার বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন; যে বিশেষ ব্যবস্থার কথা আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে কারো জানা ছিল না। জানা হয়েছে মাত্র গত শতাব্দিতে। তাহলে আল্লাহ্‌র এক নিদর্শন মানুষ জানতে পারল কুরআন নাযিলের বহু শতাব্দি পর । আরো জানতে পারল আল্লাহ্‌ বিশেষ ঐ যোগ্যতার কথা বহু শতাব্দি পূর্বেই আলকুরআনে বিবৃত করেছেন। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল-কুরআন সত্য এবং অলৌকিক। তো আল-কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী বলে আল্লাহ্‌র এবং তার রসূলের সাক্ষ্য রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌ যে প্রকৃতির স্রষ্টা এটা আল-কুরআনের সত্যতা ও অলৌকিকতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেল। এভাবে আমরা আবারো দেখলাম- প্রকৃতির পিছনে ক্রিয়াশীল আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ক্ষমতা।

(খ) গুরুমস্তিষ্ক

মানুষের মাথার সম্মুখভাগ তথা গুরুমস্তিষ্ক সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণা জ্ঞান মাত্র ষাট বছর পূর্ব থেকে অর্জন শুরু হয়েছে। Essential of Anatomy and Physiology গ্রন্থে এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে,
The motivation and foresight to plan and initiate movements occurs in the interior portion of the frontal loves, the prefrontal area. This is a region of association crates. ঐ গ্রন্থে আরও আছে In relation to its involvement in motivation, the prefrontal area is also thought to be the functional Centre of aggression.
ফলে Cerebrum এর এই অংশটুকুতে পরিকল্পনা, মোটিভেশন, ভাল বা মন্দ কর্মের প্রেরণা উদয় হয়ে থাকে এবং এই অংশটুকু সত্য বা মিথ্যা ভাষণের জন্য দায়ী। Cerebrum-এর অংশটুকু যা forelock বা forehead এর সন্নিহিত নীচে অবস্থিত, তাকে আরবীতে naseyah বলে। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলে বা পাপ করে, তা করে ঐ naseyah থেকে উদ্‌গত প্রণোদনা থেকে। ফলে গুরুমস্তিষ্ক বা naseyah এর অপর নাম হতে পারে সত্যবাদী গুরুমস্তিষ্ক কিংবা মিথ্যাবাদী গুরুমস্তিষ্ক বা পাপী গুরুমস্তিষ্ক। কারণ naseyah বা গুরুমস্তিষ্কই দায়ী ঐ সমস্ত কর্মের জন্য। গুরুমস্তিষ্ক বা naseyah এর কারণে মানুষ সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী যা পাপী হয়, একথা তো চৌদ্দশত বছর পূর্বে কুরআন নাযিলের সময়ে পৃথিবীর কেউই জানতো না। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ষাট-সত্তর বছর পুরনো মাত্র। অথচ গুরুমস্তিষ্ক সম্পর্কে আল-কুরআনে মিথ্যাবাদী-পাপী বিশেষণ আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই উঠে এসেছে আল্লাহর বাণী হিসেবে। আল-কুরআনে একজন অবিশ্বাসী, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবা প্রাঙ্গণে নামাজ পড়তে বাধা দিয়েছিল, তার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, No! if he does not stop, we will take him by the naseyah (forelock) a lying, sinful naseyah! (Qurah 96: 15-16) । কুরআন এখানে লোকটিকে সরাসরি মিথ্যাবাদী, পাপী সম্বোধন করছে না- বরং লোকটির শাস্তি সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে লটকানো হবে মাথার সম্মুখ ভাগ ধরে বা forehead ধরে। আর ঐ forehead যাকে ধরে লোকটিকে লটকানো হবে, সেটি অর্থাৎ ঐ forehead বা naseyah হলো একটি পাপী, মিথ্যাবাদী forehead বা naseyah আর আজ আমরা জানি মানুষ মিথ্যাবাদী হয়, পাপী হয় ঐ সকল প্রণোদনা থেকে যার উৎস গুরুমস্তিষ্ক বা naseyah অর্থাৎ Cerebrum এর ঐ অংশটুকু থেকে ঐসব পাপ মিথ্যার প্রণোদনা আসে যা থাকে forelock বা forehead এর সন্নিহিত নীচে- যার আরবী প্রতিশব্দ naseyah। তাই আল্লাহ একসঙ্গে বলে দিলেন-ঐ পাপীর শাস্তি হবে মাথার ঐ অংশটুকু ধরে লটকিয়ে যে অংশটুকু দায়ী তার পাপী হবার। আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানুষের মস্তিষ্কের একটি অংশের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে আল কুরআনে। নিঃসন্দেহে আল-কুরআন সত্য ও অলৌকিক কিতাব যার উৎস মহান স্রষ্টা আল্লাহ। এভাবে আমরা পুনরায় উপনীত হলাম এক সত্যের সামনে। আল্লাহর নিদর্শন উপস্থিত হলো আমাদের সামনে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে আর আল-কুরআনের ভাষ্যে। নিংসন্দেহে আল-কুরআন সত্য। আল্লাহর বাণী আবার প্রমাণিত হলো- আল্লাহ আমাদের নিজেদের মধ্যে অবস্থিত নিদর্শন দেখালেন এবং তার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন- আল-কুরআন সত্য। আবার আমরা দেখলাম মহান রবের চেহারা অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব তাঁর সৃষ্টি কৌশলের মাধ্যমে আমাদের কাছে সত্য হয়ে ধরা দিল। এজন্যেই আল্লাহ বলেন, Wherever you turn (your faces) there is the Face of Allah.

(গ) গভীর সমুদ্রে জল তরঙ্গ

সমুদ্রে পানির সারফেসে সর্বদা তরঙ্গ আন্দোলিত হতে থাকে। এগুলোকে বলে surface wave. এছাড়াও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যে, দু'টি ভিন্ন ঘণত্বের পানির স্তরের সংযোগ তলে অন্তঃতরঙ্গ বলে এক ধরনের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এসব অন্তঃতরঙ্গ সমুদ্রের গভীরে জল স্তরকে সর্বদা আন্দোলিত রাখে, কেননা সমুদ্রে নীচের পানির স্তর উপরের পানির স্তরের চেয়ে ঘন। ফলে সেখানে সংযোগতল সৃষ্টি হয় অনেক। যেখানেই কোন সংযোগ তল থাকে, সেখানেই তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গগুলো surface wave এর মতোই তবে এগুলো মানুষের দৃষ্টির বাইরে থাকে। এই দু'প্রকারের তরঙ্গের কথা আল-কুরআনে অন্য এক প্রসঙ্গে আল্লাহ উল্লেখ করেন এভাবে,"Or (the unbelievers state) is like the darkness in a deep sea. It is covered by waves, above which are waves, above which are cloud. Darkness, one above another. If a man stretches out his hand, he cannot see it. (Quran; 24:40)। আঁধার এই আয়াতে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে এবং সেইসাথে দু'প্রকারের তরঙ্গের কথা বলা হয়েছে। Deep in the sea অর্থাৎ সমুদ্রের গভীরের তরঙ্গের কথা প্রথমে বলা, তারপর বলা হয়েছে surface wave প্রসঙ্গে। সমুদ্রের গভীরের তরঙ্গ সম্পর্কে কেউই জানতো না আলকুরআন নাযিল কালে। মাত্র সম্প্রতি এসব তরঙ্গ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আসছে। অথচ আল-কুরআন সুস্পষ্টভাবে দু'প্রকারের তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে চৌদ্দশত বছর পূর্বে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ নিঃসন্দেহে মহাবিশ্বের স্রষ্টা, আমাদের স্রষ্টা। আমরা কেন তাঁর ইবাদাত করব না? একজন ঈমানদারের ভাষ্যে আল-কুরআন বলে, "And what reason have I that I not worship Him who has created me, and unto Whom you will be brought back? (Quran, 36:22"।

(ঘ) মেঘমালা প্রসঙ্গে

বিজ্ঞানীরা মেঘমালা সম্পর্কে যে দীর্ঘ গবেষণা করে চলেছেন, তাতে যেসব বৈজ্ঞানিক সত্য বেরিয়ে এসেছে যেগুলো আল-কুরআনের এ সম্পর্কিত বাণীর সত্যায়ন করেছে সন্দেহাতীত রূপে। বৃষ্টি দানকারী মেঘমালার মধ্যে এক প্রকার মেঘের নাম Cumulonimbus cloud. আবহাওয়া বিজ্ঞানীগণ এই বিশেষ বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ও বিদ্যুৎচমক কিভাবে সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছেন। তারা দেখতে পেয়েছেন Cumulonimbus cloud কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে তবেই বৃষ্টি দেয়। এই ধাপগুলো হলো-বায়ুপ্রবাহ মেঘমালাকে চাপ দেয়। ক. বায়ুচাপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ একস্থানে জড়ো হয়ে Cumulonimbus সৃষ্টির সূচনা হয়। খ. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ কেন্দ্রীভূত হয়ে বড় আকারের মেঘ তৈরী হয়। গ. যখন ক্ষুদ্রাকৃতির মেঘ একত্রিত হয়, তখন স্বাভাবিক বিজ্ঞান অনুসারে বড় আকারের মেঘটির অভ্যন্তরে উর্ধ্বচাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ঊর্ধ্বচাপের পরিমাণ মেঘমালার বহিরঙ্গের চেয়ে কেন্দ্রীয় এলাকায় বেশী হয়। ফলে উর্ধ্বমুখী চাপের কারণে মেঘমালা উপরের দিকে বিস্তৃত হয়ে মেঘ স্তম্ভের সৃষ্টি হয়। একে বলে পুঞ্জীভূত হওয়া বা Stacking। এই Stacking মেঘমালাকে বায়ুমন্ডলের অপেক্ষাকৃত শীতল এলাকায় বিস্তৃত করে, যেখানে জলকণা ও শিলার সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো বড় হতে থাকে। যখন ঊর্ধ্বচাপ এসব জলকণা ও শিলা স্তম্ভকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়, তখনই সেগুলো মেঘমালা থেকে বৃষ্টি ও শিলা বৃষ্টি আকারে ভূপৃষ্টে নেমে আসে।

আল্লাহতায়ালা আলকুরআনে বলেন, Have you not seen how Allah makes the cloud move gently, then join them together, then makes into stack, and then you see the rain come out of it. (Quran: 24:43)। এই আয়াতে পূর্বালোচিত তিনটি ধাপই পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ সবেমাত্র এই জটিল বৈজ্ঞানিক বিশয় সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, অথচ চৌদ্দশত বছর পূর্বেই এসব বৈজ্ঞানিক বিষয় ধারণ করে আছে আলকুরআন। উপর্যুক্ত আয়াতে মেঘ ও বৃষ্টিসম্পর্কে বলার পর শিলাবৃষ্টি ও বিদ্যুৎচমক সম্পর্কে বলা হয়েছে- And He sends down hail from mountains (clouds) in the sky, and He strikes with it whomever the wills, and turn it from whoever He wills. The vivid flash of its lighting

nearly blinds the sight. (Quran: 24:43)। এখন আবহাওয়াবিদগণ বলেন, যেখান থেকে শিলাবৃষ্টি হয়, ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছায়। অর্থাৎ এই মেঘ পর্বত সমান উঁচু, কুরআন বলছে, And He sends down hail from mountains (clouds) in the sky.

উপর্যুক্ত আয়াত একটি প্রশ্নের জন্ম দেয়- কেন এই আয়াতে শিলাবৃষ্টির সঙ্গে its lightening শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হলো? এটা কি এই বুঝায় যে; শিলাখন্ডের পতন বিদ্যুৎ চমকের জন্যে কোন ফ্যাক্টর? আবহাওয়াবিষয়ক গ্রন্থে রয়েছে যে, যখন শিলাখন্ড মেঘের অভ্যন্তরে অতি শীতল জলকণা ও বরফকণার মধ্যে দিয়ে নীচের দিকে ধাবিত হয়, তখন এটি বিদ্যুৎ তাড়িত হয়ে যায়। যখন তরল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা শিলাখন্ডের সাথে ঘর্ষিত হয়, তখন জলকণাগুলো বরফে পরিণত হয় এবং সেগুলো সুপ্ত তাপ ছেড়ে দেয়। এভাবে শিলাখন্ডের বহিঃস্থ তল আশপাশের বরফখন্ডের চেয়ে উষ্ণ থাকে। আর অপেক্ষাকৃত শীতল বরফের চাই থেকে উষ্ণ শিলাখন্ডে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়। এভাবে শিলাখন্ড ঋণাত্মক চার্জ লাভ করে। একই ঘটনায় বরফ কণাগুলো ধনাত্মক চার্জ প্রাপ্ত হয়। ধনাত্মক চার্জ প্রাপ্ত এসব হালকা বরফকণা ঊর্ধ্বচাপের কারণে মেঘমালার উপরাংশে নীত হয়। আর ভারী শিলা খন্ডগুলো নীচের দিকে ধাবিত হয়। ফলে মেঘের নীচের অংশ ঋণাত্মক ও উপরের দিকটা ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হয়ে যায়। নীচের ঋণাত্মক আধান স্বাভাবিক নিয়মে ডিসচার্জ হয়ে উপরের দিকে লাফ দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের সৃষ্টি করে। সুতরাং এটা বলা যায় যে, শিলা বিদ্যুৎচমক সৃষ্টির জন্য একটি প্রধান ফ্যাক্টর। বিদ্যুৎচমকের এই বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু আল-কুরআন এই বিষয়গুলো বিজ্ঞানের উন্মেষের হাজার বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছে। আল্লাহ তায়ালা আলকুরআনে তাঁর নিদর্শনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বহুবার বৃষ্টির প্রসঙ্গ এনেছেন এবং উদ্ধৃত আয়াতে Cumulonimbus cloud ও বিদ্যুৎচমকের বিষয়ে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহই প্রকৃতির স্রষ্টা ও রক্ষক-ধারক। আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন প্রকৃতিতে প্রতিটি বিষয়ে উপস্থিত এবং তা আরো স্পষ্ট হয়েছে আল-কুরআনে বর্ণিত বেশ কিছু নিদর্শনের বিস্তারিত বর্ণনায়। যেমনটি আমরা এই অংশের আলোচনায় পেলাম। এভাবে আল্লাহকে দেখছি আমরা প্রকৃতির পেছনের মুখ্য কারিগর হিসেবে। আল্লাহ তাই বলেন, Wherever you turn (your faces) there is the Face of Allah.

(ঙ) মহাবিশ্বের সূচনা ও সম্প্রসারণ

এই মহাবিশ্ব এক বিশাল সৃষ্টি। এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ তথা আয়তন এতই অকল্পনীয় রকম বিশাল যে, কল্পনায় শধু বিস্মিত হওয়া যায়। কিন্তু কল্পনা করা যায় না। এই বিশাল মহাবিশ্বের building block হচ্ছে গ্যালাক্সীসমূহ। একেকটি গ্যালাক্সী এত বিশাল যে, কল্পনা এখানেও মুষড়ে যায়। তবে কিছুটা কল্পনা করা যায় ছোট বা মাঝারী আকারের কিছু গ্যালাক্সীর আয়তন। যেমন, আমাদের সৌরজগত মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সীর একটি সাধারণ নক্ষত্র। এই গ্যালাক্সীতে রয়েছে প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্র, যার একেকটি আমাদের সুযের মতই। মিল্কিওয়ের আকার অনেকটা একটি চাকতির মত। এই চাকতির ব্যাস হলো প্রায় দেড় লক্ষ আলোকবর্ষ। আর পুরুত্ব হলো প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ। এক আলোকবর্ষ বলতে সেই দূরত্বকে বুঝায় যে দূরত্ব আলোক তার গতিতে ভ্রমণ করতে এক বছর সময় নেয়। ফলে বলা যায় মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে আলোকরশ্মি সময় নেয় প্রায় দেড় লক্ষ বৎসর। এত বিশাল বিস্তৃত একেকটি গ্যালাক্সী- আর মহাবিশ্বে গ্যালাক্সী আছে প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি। গ্যালাক্সীসমূহ পরস্পর থেকেও বহু বহু দূরে। সুতরাং পুরো মহাবিশ্বটা অকল্পনীয় রকম বিশাল। আরেকটি কথা হলো- গ্যালাক্সীগুলো পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে চলেছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানী Hubble এর একটি সূত্র আছে। দুটি গ্যালাক্সী মধ্যকার দূরত্ব যত বেশী -তাদের পরস্পর থেকে দূরে যাবার গতিবেগও ততবেশী। মোটকথা, মহাবিশ্বটা সম্প্রসারিত হচ্ছে ক্রমশ। একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য এটি। আর প্রসারণের প্রকৃত হার নিয়ে এখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। অতি সম্প্রতিক আবিষ্কার বলে যে, অতীতে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়েছে ক্রম হ্রাসমান হারে। আর বর্তমানে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে ক্রমবর্ধমান হারে। অর্থাৎ সম্প্রসারণের সাথে যে ত্বরণটি যুক্ত সে ত্বরণ বর্তমানে ধনাত্মক। সুদূর অতীতে এটি ছিল ঋণাত্মক। যাহোক- মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এখন যদি আমরা মহাবিশ্বের ইতিহাসকে পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাই- তবে দেখা যায় মহাবিশ্বটা একসময় একটি বিন্দু ছিল। সেই বিন্দু একটি অনুপম বিন্দু, যার শক্তি, বস্তু ও বক্রতা ঘনত্ব ছিল অসীম। অসীম উষ্ণও ছিল সেই বিন্দুটা। এখন সাধারণ জ্ঞানই বলে অসীম বস্তু ঘণত্ব ও অসীম উষ্ণ একটি বিন্দু স্থিতাবস্থায় থাকতে পারেনা। ফলে

মহাবিশ্বের আদি সেই অনুপম বিন্দুটি, যেভাবেই সেটি সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, বিস্ফোরিত হবেই। বিজ্ঞানীরা সুনিশ্চিত যে, তাই হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় ১৩৭৩ কোটি বছর পূর্বে মহাবিশ্বটা একটি অনুপম বিন্দুর মহা বিস্ফোরণে জন্ম নেয় এবং তখন থেকে ধীরে ধীরে নক্ষত্রসমূহ, গ্যালাক্সীসমূহ সৃষ্টি হতে থাকে, সেসাথে মহাবিশ্বটা সম্প্রসারিত হতে থাকে। সুতরাং দুটি বিষয় বলা হলো-

ক. যাকে আমরা নভোমন্ডল বলি আর যাকে ভূমন্ডল বলি, এ দুটি এক সময় একই স্থানে মিলিত ছিল। মহাবিস্ফোরণের পর ধীরে ধীরে মহাবিশ্বটা এখন যেমন তেমন হয়েছে। অর্থাৎ এখন আমরা বলি আকাশ ও পৃথিবী। পৃথিবী থেকে এ নামেই মহাবিশ্বকে আমরা চিনি। আমরা পৃথিবীবাসী আর আমরা দেখছি মহাবিশ্বটা হলো আমাদের পৃথিবী ও আকাশ। অন্যকথায়- সহজে বলা যায়- আকাশ ও পৃথিবী এক সময় যুক্ত এক পিন্ড ছিল- বদ্ধ ছিল যাকে খুলে দেয়া হয়েছে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আল্লাহর কালামে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিলিত ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম।" (সূরা আম্বিয়াঃ ৩০)। কি সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক বক্তব্য। আমাদের উপরের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে একেবারে মিলে গিয়েছে আলকুরআনের এই বক্তব্য। শুধু তাই নয়, মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারিত হচ্ছে তারও বর্ণনা আল-কুরআনে বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন, "আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।" (সূরা যারিয়াতঃ ৪৭)। এখানেও কোন অস্পষ্টতা নেই। আল্লাহই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি একে সম্প্রসারিত করে চলেছেন। এভাবেই মহাবিশ্বের সূচনা এবং এর সম্প্রসারণ যা কেবল সম্প্রতি আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক বিষয়, তা চৌদ্দশত বছরের পুরনো কিতাব আলকুরআনে সরল ও সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। সুতরাং আল্লাহর কিতাব কে সত্য না বলে কোন জ্ঞানীর পক্ষে সত্যবাদী হওয়া সম্ভব নয়। আর জ্ঞানের এই প্রকাশ অর্থাৎ আলকুরআন সত্য মানে আল্লাহ মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক- এই জ্ঞান আমাদেরকে দিচ্ছে আল্লাহ অভিমুখী হবার দর্শন ও প্রেরণা।

(চ) সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ

ভৌতবিশ্বে আশ্চর্যজনক এক নিয়ম-শৃঙ্খলা রয়েছে । এর সৃষ্টিতে রয়েছে এক সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ। ইংরেজীতে একে বলে Fine tuning। কোন কিছু নির্ধারণ করার সময় এর চূড়ান্ত পরিণতি যা উচিত তার জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ামক বিষয়গুলো সুক্ষাতিসুক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করাকে বলে Fine tuning বা সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ। জ্যোতির্বিদগণ আবিষ্কার করেছেন যে, এই মহাবিশ্ব, আমাদের ছায়াপথ, সৌরজগত সুক্ষাতিসুক্ষভাবে Fine tuning করা যে, এর একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, একজন মহাবিজ্ঞ স্রষ্টা এগুলো তাঁর মহান কর্মকুশলতার মাধ্যমে সুক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে যে, এই পৃথিবীতে জীবনের উপস্থিতি, বিশেষতঃ মানবের অস্তিত্ব, মহাবিশ্বের নিয়ামক রাশিগুলোর অতিব্যাপক ও অতিসুক্ষ Fine tuning এর কারণেই সম্ভব হয়েছে। এই Fine tuning না থাকলে মানুষতো দূরের বিষয়, মহাবিশ্বও সুশৃঙ্খলতার সাথে যেভাবে আছে সেভাবে থাকতো না। Fine tuning এর নজীর জ্যোতির্বিদ্যায় দেখা যায়, তার কয়েকটি উল্লেখ করছিঃ

১. মহাকর্ষীয় ধ্রুবকঃ যেমন আছে তার চেয়ে অতি সামান্য বড় হলে নক্ষত্রসমূহ এত বেশী উত্তপ্ত হয়ে যেত যে, এরা অতি দ্রুত জীবনকাল নিঃশেষ করে ফেলতো। অতি সামান্য কম হলে নক্ষত্রসমূহ অতিশীতল থেকে যেতো এবং কোন ফিউশন বিক্রিয়া হতোনা, ফলে কোন ভারী মৌল সৃষ্টি হতোনা। ভারী মৌল সৃষ্টি না হলে পৃথিবীর মত গ্রহ ও এর বাসিন্দা প্রাণীজগত অস্তিত্বই পেতোনা।
২. ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভরের অনুপাতঃ একটু বেশী বা কম হলে রাসায়নিকবন্ধন অসম্ভব হয়ে যেত। ফলে কোন অণু সৃষ্টি হতোনা, যৌগিক ও জটিল প্রাণকোষ সৃষ্টি তখন অসম্ভব হতো। মানুষের অস্তিত্ব তখন অসম্ভব হয়ে যেতো।
৩. মহাবিশ্বের প্রসারণের হারঃ একটু বেশী হলে কোন গ্যালাক্সী গঠিত হতো না। একটু কম হলে মহাবিশ্বে নক্ষত্র সৃষ্টির পূর্বেই মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো।
৪. আলোর গতিঃ একটু বেশী হলে নক্ষত্রসমূহ অতি উজ্জ্বল হয়ে পড়তো। একটু কম হলে নক্ষত্রসমূহ অপর্যাপ্ত আলোকসম্পন্ন হতো।

আরো প্রণিধান যোগ্য আবিষ্কার এই যে, আমাদের ছায়াপথ, সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র নিয়ে জগত- এটিও এমনভাবে Fine tuning হয়েছে যে, এই পৃথিবীতে মানব ও অন্যান্য জীব অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন যে, কেবল

একটি বিশেষ নক্ষত্র এবং সে নক্ষত্র থেকে বিশেষ দূরত্বে স্থাপিত বিশেষ একটি গ্রহেই প্রাণধারণের শর্তসমূহ প্রতিপালিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রণিত Fine tuning সমূহের কিছু এমনঃ
১. মূল নক্ষত্রের বয়সঃ যদি আরো নবীন বা আরো প্রবীণ হতো তবে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য অতিদ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকতো।
২. মূল নক্ষত্রের রংঃ যদি আরো লালাভ বা আরো নীলাভ হতো তবে এই গ্রহে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হতো।
৩. মূল নক্ষত্র থেকে গ্রহটির দূরত্বঃ যদি আরো দূর বা আরো নিকট হতো গ্রহটি, অতি উত্তপ্ত বা অতি শীতল হতো, ফলে স্থায়ী পানিচক্র সৃষ্টি হতোনা এবং জীবনধারণ সম্ভব হতোনা।
৪. গ্রহটির কক্ষ পথের আনতি কোণঃ যদি বেশী হতো তবে গ্রহের একস্থান থেকে অন্য স্থানের তাপমাত্রার ব্যবধান অনেক বেশী হতো, ফলে জীবনধারণ অসম্ভব হতো।
৫. গ্রহটির ঘূর্ণন গতিঃ যদি আরো শ্লথ হতো, তবে আহ্নিক তাপমাত্রা ব্যবধান অনেক বেশী হতো,ফলে জীবন ধারণ অসম্ভব হতো।
৬. বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনঃ যদি পরিমাণে বেশী হতো তবে গাছপালা এবং হাইড্রোকার্বন অতি সহজে জ্বলতো। যদি অক্সিজেন পরিমাণে কম হতো তবে উন্নত প্রাণীর শ্বাসপ্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হতো।
৭. মহাদেশ ও সমুদ্রসংখ্যা অনুপাতঃ যদি বেশী বা কম হতো তবে প্রাণী বৈচিত্র ও জটিল প্রাণ উভয়ই সীমিত হয়ে পড়তো।

উপর্যুক্ত Fine tuning-এর বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মহাকাশ ও পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে বা বলা যায়, বাধ্য করা হয়েছে, অনুগত করা হয়েছে যেন মানবজাতি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে ও উপকার লাভ করতে পারে। এবারে দেখুন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এই বিষয়ে কী বলে? আল-কুরআনে বিষয়টি এক অমোঘ সত্য হিসেবে বারংবার উল্লিখিত হয়েছে একটি বিশেষ পারিভাষিক শব্দের মাধ্যমে। শব্দটি হলো- 'ছাখখারা' এবং এই শব্দের মাধ্যমে যে বিষয়টি বুঝানো হয় সেটি হলো 'তাছখির'। তাছখির এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো- 'অনুগত করা বা বাধ্য করা বা অধীন করে দেয়া'। ইংরেজীতে হলো 'to make subject'। এটি এসেছে 'ছাখখারা' শব্দ থেকে যার অর্থ হলো, কোন কিছুকে কাজে লাগানো, কোন কিছুকে অন্য কিছুর বাধ্য করে দেওয়া, কোন কিছুকে অনুগত করা। আলকুরআনে বর্ণিত তাছখির হলো- আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতায়ালা কর্তৃক মহাবিশ্ব ও পৃথিবীকে মানবজাতির উপকারে নিয়োজিত করা; যেন মানবজাতি আল্লাহর বহুধাবিভক্ত অসংখ্য অনুগ্রহ উপলব্ধি করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অনেকগুলো আয়াতে তাছখির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপঃ
১. তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি নদীসমূহকে তোমাদের অধীন করেছেন। তিনি অধীন করেছেন আবর্তনশীল সূর্য ও চন্দ্রকে এবং তোমাদের অধীন করেছেন রাত ও দিনকে। (সূরা ১৪ঃ ৩২-৩৩)।
২. তোমরা কি দেখনা মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের অধীন করে দিয়েছে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ প্রদর্শক এবং না আছে দীপ্তিমান গ্রন্থ। (সূরা ৩১ঃ ২০)।
মহাবিশ্ব ও পৃথিবীকে মানুষের অধীনস্ত করে দেয়া বা তাছখির এর ব্যাখ্যা ব্যাপক একটি বিষয়। সংক্ষেপে এর অর্থ এরূপ,

১. পৃথিবীর পরিবেশ যা মানুষের অস্তিত্ব ও জীবনধারণের একমাত্র পরিবেশ, তা সৃষ্টির জন্য পুরো মহাবিশ্বকে Fine tune করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমগ্র মহাবিশ্বের অযুত কোটি গ্যালাক্সী, নক্ষত্র ইত্যাদির প্রয়োজন কেবল মানুষের অস্তিত্বের জন্যই ও টিকে থাকার জন্যই। সুতরাং মহাবিশ্ব ও সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবীকে Fine tuning করে সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মানুষের অস্তিত্ব, জীবনধারণ ও উপকার লাভ। এই অর্থে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল মানুষের অধীন।
২. নক্ষত্র-সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদির আলোক ও এদের গতিবিধি মানুষের জীবন ধারণের ও জীবন যাপনের সহায়ক শক্তি। এই অর্থে এসকল মানুষের অধীন। এ সকল যাতে মানুষের উপকার সাধন করতে পারে সেজন্যই এ সকল সৃষ্টিকে Fine tune করা হয়েছে।
৩. মানুষ প্রয়োজনে পৃথিবীর সকল কিছুকে কাজে লাগাতে পারে। এই অর্থে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও বিষয় মানুষের অধীন। এই অধীনতা সৃষ্টি করার জন্য প্রাকৃতিক নিয়মনীতিসমূহ Fine tune করা হয়েছে।
৪. মানুষ সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও গতিবিধির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আয়ত্ব করতে পারে ও প্রকৃতই পারছে। জ্ঞানের নিরিখে মহাবিশ্ব মানুষের আয়ত্তাধীন। এভাবে Fine tuning করার অপর নাম make subject বা আরবীতে তাছখির। যা এসেছে ছাখ্খারা থেকে।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মহাবিশ্বে Fine tuning আছে, আর আমরা কুরআন থেকে পেয়ছি তাছখির। উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, Fine tuning ও তাছখির একই সূত্রে গাঁথা। অতএব আল কুরআনের লেখক আল্লাহতায়ালা সত্য সত্যই মহাবিশ্বের স্রষ্টা যিনি সমগ্র মহাবিশ্ব মানুষ সৃষ্টির জন্য Fine tune করেছেন, অপর কথায় সমগ্র মহাবিশ্ব মানুষের প্রয়োজনেই, মানুষের অধীন করে দেবার জন্যই এই Fine tuning। তাছখির আছে বলেই Fine tuning ছিল। যে Fine tuning করেছেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ। এভাবে আধুনিক বিজ্ঞান আর আলকুরআন একই কথা বলছে। সুতরাং আমরা যখন প্রকৃতির যে কোন বিষয় বা বস্তু নিয়ে গবেষণা করি, সেখানেই দেখা পাই মহান স্রষ্টা আল্লাহর কুশলীকর্মের। আল্লাহর চেহারা লুকিয়ে আছে সকল অস্তিত্বের পেছনে, সকল বস্তুর পেছনে, সকল বিজ্ঞানের পেছনে। আল্লাহকে ভুলে থাকা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব এখন আর নয়।

এভাবে, পুণঃ পুনঃ আমরা ফিরে যাই সেই সত্যে যে, মহাবিশ্ব কারণহীন নয়। আল্লাহ এর স্রষ্টা। মহাবিশ্ব উদ্দেশ্যহীন নয়। আল্লাহতায়ালা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে মহাবিশ্বের পত্তন করেছেন। সেই উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির পত্তন। মানুষকে সম্মানজনক অবস্থান দিয়ে পরীক্ষা করা যে, এরা কতটুকু তার প্রভুর বন্দেগী করে। কতটুকু ভালোবাসে একমাত্র সৌন্দর্য, দয়ামায়ার একমাত্র উৎস আল্লাহকে। এই প্রবন্ধের সার হলো এই কথা যে, মহাবিশ্বের বাস্তবতা এককেন্দ্রিক। যার কেন্দ্র আল্লাহতায়ালা। আল্লাহতায়ালা অদৃশ্য কিন্তু তিনি বোধিতে সহজেই ধরা পড়ছেন। এভাবে যদিও তিনি hidden, কিন্তু তারপরও তিনি manifest. তিনি গোপন বটে, তবে তিনি প্রকাশিতও অন্য অর্থে। মহাবিশ্বের, প্রকৃতির যেদিকেই তাকাই এবং গবেষণা করি আমরা দেখি সেখানেই রয়েছে স্রষ্টার স্বাক্ষর। আল্লাহর চেহারা। তাকে দেখাযায়-রাত্রির আগমণে, দিনের বিদায়ে। রাত্রির বিদায়ে, দিনের আগমণে। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন, “And a sign for them is the night from which we strip off the day, and behold! They are in darkness.” (Quran: 36:37). আরো বলেন, “And the dead earth is a sign for them: We quicken it and bring forth therefrom grain, of which they eat. ” (Quran: 36:33). তারপরও অনেক মানুষ অহংকারবশতঃ আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার প্রসঙ্গ উপেক্ষা করে নিজেরা জাহান্নামের পথে চলছে, সেসাথে অসংখ্য বনী আদমকে জাহান্নামে নিয়ে চলেছে।